লাভক্র্যাফট অমনিবাস

প্রতিম দাস

বেঙ্গল ট্রয়কা পাবলিকেশন

লেখকের কৈফিয়ত

অদ্রীশ বর্ধন সহ বর্তমান সময়ের একাধিক দক্ষ লেখক এইচ পি লাভক্র্যাফটের অনুবাদ করা সত্বেও নিতান্তই অর্বাচীন আমি কেন সেই একই কাজ করায় ব্রতীবাচী? এই প্রশ্নটা নিশ্চিতভাবেই মানুষের মনে ঢেউ তুলেছে। তার ওপরে এমন একজন লেখক যার লেখাকে আক্ষরিক অর্থেই বোঝার পক্ষে 'দাঁতভাঙ্গা শব্দরাজির মাথা গুলিয়ে দেওয়া লেখনী' বলে থাকেন বেশীর ভাগ পাঠক বা গবেষক। আমি নিজেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি বছর তিরিশ আগে। বেশিদূর এগোতে পারিনি পড়ার ক্ষেত্রে। সেই সময়েই মনের ভেতর একটা ছোট্ট আশা জন্মেছিল এইসব লেখা বোঝার এবং আমার মত যারা বুঝতে পারেনা তাদের জন্য অনুবাদ করার। তারপর আঠাশ বছর পার হয়েছে । সেই ভাবনা ভুলেও গিয়েছিলাম। ইত্যবসরে ফেসবুকের একটি কল্পবিজ্ঞান চর্চার গ্রুপ তাদের ওয়েব ম্যাগাজিন বিশেষ সংখ্যা করে লাভক্র্যাফটকে নিয়ে। মনের ভেতর চাপা পড়ে থাকা ইচ্ছেটা আবার মাথা চাড়া দেয় ওই সংখ্যা পড়ার পর। কয়েকদিন বাদেই পড়ি এবং কেবলমাত্র ভালবাসা থেকে সাহস করে অনুবাদ করি 'পোলারিস' গল্পটা। পোস্ট করি ওই গ্রুপ এবং নিজের ওয়ালে যা চোখে পড়ে শ্রদ্ধেয় রনেন ঘোষ স্যারের। উনি ফোন নম্বর দিয়ে কথা বলতে বলেন। প্রায় আধঘণ্টার সেই বাক্যালাপে যে উৎসাহ উনি দেন, বলা যায় তারই ফল এই কাজ।

এক এক করে বেশ কিছু গল্প এবং একাধিক মানুষের অনুরোধে The call of Cthulu অনুবাদ করি এবং পোস্ট করি। যার সূত্রে অনেক মানুষ উৎসাহ দিয়ে যান নিরন্তর। ভালবাসা বেড়ে যায় কাজটা করার। আর সেটাই যোগায় সাহস। লেখকের মোট ৩০টা রচনা অনুবাদ করে ফেলি এক এক করে। ইচ্ছে আছে বাকিগুলোকেও অনুবাদ করার।

সূচিপত্র

দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য নেক্রোনমিকন	৯
হি	১২
অ্যাজাথথ	২৪
দ্য মুন বগ	২৬
সেলেফাইস	৩৬
দ্য পিকচার ইন দ্য হাউস	৪৪
ড্যাগন	৫৩
দ্য স্টেটমেন্ট অফ রান্ডল্‌ফ কার্টার	৬০
মেমরি	৬৮
পিকম্যান'স মডেল	৭০
নাইরলাথোটেপ	৮৬
অবলিভিয়ন	৯০
দ্য টেরিবল ওল্ড ম্যান	৯৩
দ্য ট্রি	৯৭

দ্য বুক	১০২
দ্য ক্যাটস অফ উলথার	১০৭
হোয়াট দ্য মুন ব্রিংস	১১২
দ্য হোয়াইট শিপ	১১৫
দ্য অ্যালকেমিস্ট	১২৩
দ্য ট্রানসিশন অফ জুয়ান রোমেরো	১৩৩
দ্যা ডিসেন্ড্যান্ট	১৪১
হিপনোস	১৪৬
পোলারিস	১৫৫
দ্য ভেরি ওল্ড ফোক	১৬০
দ্য কোয়েস্ট অফ ইরানন	১৬৮
দ্য স্ট্রিট	১৭৬
ইবিড	১৮৩
আ রেমিনিনিসেন্স অফ ড: স্যামুয়েল জনসন	১৮৯
দ্য কার্স অফ য়িগ	১৯৫
দ্য কল অফ সিথুলু	২১৬

দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য নেক্রোনমিকন
The History of The Necronomicon
১৯২৭

আসল শিরোনাম ছিল 'আল আজিফ'। আজিফ শব্দটা আরবরা ব্যবহার করে নিশি রাতের শব্দ [পোকামাকড়ের ডাক] বোঝাতে। সম্ভবত সেইসব জান্তব চিৎকার যা আধা মানব-আধা দেবতাদের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়।

ইয়েমেনের সানা প্রদেশ নিবাসী এক উন্মাদ কবি আব্দুল আলহাজ্রেদ এই পুস্তকের রচয়িতা। বলা হয়ে থাকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দে যখন ওমিয়াদে খলিফার রাজত্ব কালে উনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

একাই নাকি ঘুরে দেখেছিলেন ব্যাবিলনের ধ্বংসাবশেষ এবং মেমফিসের ভূগর্ভস্থ গোপন এলাকাগুলো। দশ বছর একাকী ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন আরবের বিশাল দক্ষিণাঞ্চলীয় মরুভূমিতে। 'রোবা এল খলিয়াহ' বা আদিম অধিবাসীদের "শূন্য স্থান" - এবং "দহনা" বা আধুনিক আরবদের দ্বারা কথিত "রক্তলাল" মরুভূমির নাম এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মনে করা হয়ে থাকে এই সব স্থান পাহারা দেয় শয়তানী আত্মা আর মৃত্যুরূপী দানবেরা। এই মরুভূমিদের বিষয়ে অনেক অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য রকমের বিস্ময়কর কাহিনী সেই সব মানুষেরাই বলে থাকেন যারা ভান করেন এই মরুভূমির ভেতরে তারা গিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ কয়েকটা বছর আলহাজ্রেদ দামাস্কাসে বসবাস করেছিলেন। সেখানেই নেক্রোনোমিকন (আল আজিফ) লেখা হয়েছিল।তার চূড়ান্ত মৃত্যু বা অন্তর্ধান (৭৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বিষয়ে অনেক ভয়ানক এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ কথাবার্তা প্রচলিত আছে। ইবনে খল্লিকান (১২তম শতাব্দীর একজন জীবনী লেখক) তার বিবরনীতে লিখে গেছেন – আলহাজ্রেদকে ঝকঝকে দিনের আলোতে এক অদৃশ্য দানব আক্রমণ করে গিলে খেয়েছিল। আর সেই হাড়হিম করা দৃশ্য নাকি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেসময়ের প্রচুর মানুষ দেখেছিল।

তার পাগলামোরও অনেক কিস্যা প্রচলিত আছে। আলহাজ্রেদ দাবি করতেন, তিনি নাকি 'ইরাম' বা সিটি অফ পিলারস নিজের চোখে দেখেছেন। এছাড়াও বিশেষ এক স্থানে নামহীন মরুভূমি নগরের ধ্বংসাবশেষের খোঁজও নাকি তিনি পেয়েছিলেন। যার নীচে পাওয়া গেছে এমন এক জাতির নানান চমকপ্রদ বৃত্তান্ত এবং গোপন তথ্য যাদের বয়স মানব জাতির বয়সের চেয়ে অনেক অনেক বেশি।

হি
He
১৯২৫

তাকে দেখেছিলাম এক নিদ্রাহীন রাতে। নিজের প্রাণ আর দেখার ক্ষমতা বাঁচানোর তাগিদে সে সময় আমি অতি দ্রুত হাঁটছিলাম। নিউইয়র্কে আসাটাই আমার ভুল হয়েছিল। ওই মুহূর্তে আমি দারুণ রকমের আশ্চর্যজনক কিছু একটা খুঁজছিলাম। যা আমাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলাম প্রাচীন বিস্মৃত গোলকধাঁধার মতো রাস্তায়। যার আশেপাশে ছিল অসংখ্য ভুলে যাওয়া এলাকা, চারণভূমি এবং জলাশয়। এছাড়াও ছিল সেই সাইক্লোপিয়ান

আধুনিক টাওয়ার এবং তাদের চূড়াগুলো, যারা ব্যাবিলোনিয়ার মতোই নিজেদের কালো অবয়ব নিয়ে একফালি চাঁদের আলোয় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত। সেসব স্থানে অনুপ্রেরণার পরিবর্তে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম কেবলমাত্র আতঙ্ক আর মানসিক চাপের অনুভূতি। আমার কাছে সেসব হুমকির মতোই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যাব অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব এ জগৎ থেকেই।

এই বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয়েছিল ধীরে ধীরে। সূর্যাস্তকালীন সময়ে একটা সেতুর ওপর থেকে আমি এই শহরটাকে প্রথমবার দেখেছিলাম। জলের ওপরে তার অবস্থান ছিল রাজকীয়। অবিশ্বাস্য সব শিখর আর পিরামিডগুলো মাথা উঁচু করেছিল ফুলের মতো। আকাশের জ্বলন্ত মেঘের সঙ্গে মিশে ছিল বেগুনী কুয়াশা। সন্ধ্যার প্রথম তারারা এক এক করে ফুটে উঠছিল সেখানে। একটু বাদেই একের পর এক জানলায় জ্বলে উঠতে শুরু করল আলো। আলাদা আলাদা ধরন ও বিচ্ছুরণ সেই সব আলোর। সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল এ এক স্বপ্নের জগৎ। যেখানে বয়ে যায় সুরভিত সঙ্গীতের স্রোত। যার সাথে তুলনা করা যেতে পারে কারকাসোন, সামারখন্দ আর এল ডোরাডো ছাড়াও সেই সমস্ত মহিমান্বিত এবং প্রায় বিখ্যাত স্থানগুলির বিস্ময়কর ঐতিহ্যের সঙ্গে। একটু বাদেই আমি প্রাচীনত্বের গন্ধ মাখা পথ ধরে পৌঁছে গেলাম সঙ্কীর্ণ সেই সব গলিপথ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায়, যেখানে সারিবদ্ধ লাল জর্জিয়ান ইটের দেওয়ালের গায়ে স্থিত স্তম্ভওয়ালা দরজার ওপর ছোট্ট কাচের ঘুলঘুলিগুলো তাকিয়ে ছিল সোনালী সেডান এবং কাঠের কাজ করা ঘোড়াগাড়িগুলোর দিকে। এই সব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছিল , হ্যাঁ আমি সেই প্রভূত সম্পদে সাজানো স্থানে উপস্থিত হতে পেরেছি যা আমাকে

কিছুদিনের ভেতরেই একজন কবিতে পরিণত করবে।

কিন্তু সাফল্য আর আনন্দ বোধহয় একসঙ্গে থাকতে চায় না। দিনের ঝকমকে আলোয় দেখতে পেলাম চারপাশে শুধুমাত্র অপরিচ্ছন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতা আর ক্ষতিকারক উচ্চতায় উঠে আসার হাতছনি। অথচ সেখানেই আবার রাতে চাঁদের আলো ইঙ্গিত দেয় সৌন্দর্য আর প্রাচীন জাদুর। জোর করে বানানো রাস্তায় দলে দলে হেঁটে যায় গম্ভীর কৃষ্ণকায় মানুষ। যাদের মুখে কঠোর ভাব এবং দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণতা। সে চোখে নেই কোনও স্বপ্ন। আশেপাশের বস্তু বা মানুষদের সম্বন্ধে নেই কোনও আগ্রহ। এদের সঙ্গে আমার মন জুড়ে বসে থাকা সেই নীল চোখের পুরোনো দিনের মানুষগুলোর, সবুজ ঘাসে ভরা রাস্তা আর নিউ ইংল্যান্ডের সাদা চামড়ার মানুষদের কোনওই মিল নেই।

অগত্যা কবিতার পরিবর্তে আমি নিজেকে ছেড়ে দিলাম হাড় কাঁপানো তমসা আর অসহ্য একাকীত্বের আশ্রয়ে। যার কারণেই দেখতে পেলাম অন্ততপক্ষে একটা ভয়ঙ্কর গোপন সত্যকে। যেখানে এর আগে কেউ উঁকি মারার সাহস করেনি। ফিসফিস করেও যে গোপনতা প্রকাশ করা বারণ।

কাঠ লোহা পাথর দিয়ে গড়া এই নিউইয়র্ক বা লন্ডন বা প্যারিস সেই প্রাচীন সংবেদনশীল নিউ ইয়র্ক, লন্ডন বা প্যারিসের মতো নয় মোটেই। এরা আসলে তাদের মৃতদেহ। সব কিছুকে এত নিপুণ অসিদ্ধতার সাহায্যে চলমান রেখে দেওয়া হয়েছে যাকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কেউ বুঝতেই পারবে না এরা সেই প্রাণবন্ত শহরগুলো নয় মোটেই। এই তথ্য জানতে পারার পর থেকে আমি আর আরাম করে ঘুমাতেই পারছি না। যদিও কিছুটা শান্তি ফিরে পেয়েছিলাম দিনের বেলায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস বন্ধ করে দেওয়ার পর। তখন শুধুই রাতে আমার সফর বজায় রেখেছিলাম।

অন্ধকারে এখনো অতীতের কিছু চিহ্ন প্রেতাত্মার মতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সাদা প্রাচীন দরজাগুলোর মনে পড়ে যায় কারা তাদের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত।

সাময়িক শান্তির ওই ক্ষণগুলোতে আমি কিছু কবিতাও লিখে ফেলেছিলাম। তবু এসব ছেড়ে নিজের চেনা মানুষদের কাছে আমি ফিরে যেতে রাজি হইনি। মনস্থির করেই নিয়েছিলাম, যতক্ষণ না চরম পরাজয় আমার সমস্ত সত্তাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করবে, ততক্ষণ আমি হার মানবো না। আমি ফিরব না।

এর পরেই, এক নিদ্রাহীন রাতে হাঁটার সময় আমি লোকটির দেখা পেলাম। জায়গাটা ছিল গ্রীনউইচ সেকশনের একটা অদ্ভুত রকমের গোপন একটা আঙ্গিনা। কিছু ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি ওখানে আস্তানা গেড়েছিলাম। শুনেছিলাম ওটাই নাকি কবি এবং শিল্পীদের থাকার সঠিক স্থান। নিশ্চিতভাবেই স্থানটার প্রাচীন রাস্তাঘাট, বাড়ি ঘর এবং অযাচিত রকমের প্রশস্ত সব প্রাঙ্গণ আমাকে মনে মনে আনন্দিত করে তুলেছিল। যখন বুঝতে

পারলাম কবি এবং শিল্পীরাও আর পাঁচ জনের মতোই জোরে জোরে চিৎকার করে নিজেদের ভণ্ডামো ঢাকার চেষ্টা করেন। ওদের কাছে বিশুদ্ধতা ব্যাপারটা আসলে অনেকটা রাংতার মতো। ওদের জীবন বাস্তবিক পক্ষে কবিতা ও শিল্পের মতো বিশুদ্ধ সৌন্দর্যর অস্বীকার মাত্র। তাতে আমার বিন্দুমাত্র সমস্যা হলো না। ওরা তখন ওদের খ্যাতি মধ্য গগনে। ওই সময়ে গ্রীনউইচ এক শান্ত গ্রাম। শহরের থাবা তাকে গ্রাস করতে পারেনি সম্পূর্ণ ভাবে।

ভোর হওয়ার বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে যখন এলাকার সব মানুষ নাক ডাকিয়ে ঘুমাতো আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। রহস্যময় বাতাস এসে ছুঁয়ে যেতো আমাকে। কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী মাকড়শার দল জুলজুল করে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। এগুলোই আমার আত্মাকে আমার ভেতর বাঁচিয়ে রেখেছিল। ওরাই আমাকে দিত সেই সব স্বপ্নের কিয়দংশ। যার চাহিদায় কবিরা মাথা কুটে বেড়ান।

আগস্ট মাসের এক মেঘাচ্ছন্ন দিনে রাত দুটোর সময় মানুষটা আমার কাছে এসেছিল। আমি অন্যান্য দিনের মতোই রাস্তার সঙ্গে সংযোগহীন বিচ্ছিন্ন আঙ্গিনাগুলোর কাছে পদচারনা করছিলাম। ওগুলোতে প্রবেশের ইদানীং একটাই পথ। এদিক সেদিকের ঘরবাড়ির মাঝের একাধিক আলোহীন গলিঘুঁজি। অথচ একসময় এগুলো একসঙ্গে একটা সুন্দর সাজানো বিষয়ের অংশ ছিল। এসবের কথা আমি মানুষের মুখের অস্পষ্ট গুজব মাধ্যমে জেনেছিলাম। এটা বুঝতেও পেরেছিলাম যে, আজকের কোনও মানচিত্রে এদের অস্তিত্ব নেই। আমার কৌতূহল স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়, যখন এটা জানতে পারি, এগুলোর কথা মানুষ ভুলে গেছে।

তাই যখন আমি ওগুলো খুঁজে পেলাম, তখন সেই কৌতূহল বেড়ে চারগুণ হয়ে গেল। এরকম এলাকা যে খুব বেশি নেই তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সব কিছু দেখেশুনে আমার মনে হয়েছিল, এই সব অন্ধকারচ্ছন্ন এলাকায় কালো কালো প্রাচীন দেওয়াল এবং ভাড়াটে বাড়িগুলোর মাঝখানে অল্প কয়েকজন মানুষ গোপনে বসবাস করে। একদল বিদেশী ভাষায় কথা বলা মানুষ অথবা অবহেলিত এবং অস্বাভাবিক কিছু শিল্পী। যাঁরা নিজেদের সুরক্ষিত রেখেছেন এখানে। যাঁরা তাঁদের শিল্পচর্চার হদিশ দিনের আলোয় আসতে দিতে নারাজ।

মানুষটা কোনও উপলক্ষ আমন্ত্রণ বিনাই আমার সঙ্গে যেচে কথা বলেছিলেন। ওই সময় আমি আশেপাশের লোহার রেলিংওয়ালা সিঁড়ির ধাপ যুক্ত বাড়ির দরজাগুলো এক এক করে পরীক্ষা করে দেখছিলাম। আশেপাশের নানা উৎস থেকে আগত ঝাপসা আলো এসে পড়েছিল আমার মুখের ওপর। মানুষটার মুখটা ছিল ছায়ায় ঢাকা। মাথায় ছিল চড়া কানাতওয়ালা টুপি। পরনের মান্ধাতার বাবার আমলের ক্লোকটার সঙ্গে ভালোই মানিয়েছিল। মানুষটার দিক থেকে কোনও শব্দ আসার আগেই আমি একটু চমকে উঠেছিলাম। অতিরিক্ত শীর্ণকায় একটা অবয়ব, কঙ্কালসদৃশ। কণ্ঠস্বর বিস্ময়করভাবে নরম এবং

অ্যাজাথথ
Azathoth
১৯২২

যখন পৃথিবীর বয়স অনেক বেড়ে যাবে, সাথেই আশ্চর্য হওয়ার ব্যাপারটাই যখন মানুষের মন থেকে উধাও হয়ে যাবে - তখন প্রাচীন শহরগুলির ধোঁয়ায় ভরা আকাশ কুৎসিত এবং জঘন্য লম্বা টাওয়ারের মতো সব বাড়ীতে ঢেকে যাবে। যাদের ছায়ায় কেউ সূর্য বা বসন্তের ফুলের পরাগ রেণুর স্বপ্ন দেখার আর সুযোগ পাবে না। জ্ঞানের চাবুকে তখন ক্ষতবিক্ষত হবে পৃথিবীর আদিম সৌন্দর্য। কবিরা তাদের ঝাপসা চোখ ও অন্তঃদর্শনের ক্ষমতা দিয়ে সবকিছু দেখার পরেও শুনতে পাবেন না ঘুরপাক খেতে থাকা অশরীরিদের গান। যখন নানান ভালো জিনিস বিদায় নেবে এবং বালখিল্যতা সুলভ প্রত্যাশা চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে, তখন মনে পড়বে এমন একজন মানুষের কথা, যে সাধারণ জীবনযাপন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল মহাবিশ্বের পথে, এই পৃথিবীর স্বপ্নগুলো পালিয়ে কোথায় গেলো তার অন্বেষণ করতে।

এই লোকটির নাম এবং বাসস্থানের বিষয়ে খুব অল্পই লিখিত তথ্য পাওয়া যায়। কারণ সেসব ছিল একমাত্র জাগ্রত বিশ্বের জন্য। তবে এটা বলা যেতেই পারে যে উভয় জগতের সীমারেখাই ছিল অস্পষ্ট। এইটুকু শুধু জানলেই চলবে যে সেই মানুষটা বাস করতো উঁচু দেওয়ালে ঘেরা এক নগরে। যেখানে ছিল এক নির্লিপ্ত গোধূলির আলোর রাজত্ব। সারাটা দিন ধরে মানুষটা ছায়ায় ঘেরা নগরের ভেতর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করত। সন্ধ্যায় ফিরে যেত ঘরে। সে ঘরের একমাত্র জানলাটি দিয়ে কোনো মাঠ বা ঝোপঝাড় দেখা যেত না। সেসব কিছুর বদলে দেখা যেত একটা নিস্তেজ চত্বর। যেখানে অন্য জানলাগুলোকে দেখে মনে হতো অনেকগুলো নিস্প্রভ চোখ একরাশ হতাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। কাচে ঢাকা পাল্লা ভেদ করে সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালে, হয়তো শুধু কিছু দেওয়াল আর জানলাই দেখতে পাওয়া যাবে। অবশ্য যদি ঝুঁকে পড়ে কেউ যদি কখনও অনেক দূরের আকাশের দিকে তাকানোর চেষ্টা করে, তাহলে দেখতে পাবে ছোট্ট ছোট্ট তারারা চলে যাচ্ছে এক পাশ থেকে আরেকপাশে।

মানুষটা একাকী অনেক অনেক স্বপ্ন দেখতো। অনেক অনেক পড়তে ভালবাসতো। যেহেতু স্বপ্নেরা হারিয়ে যাওয়ার পর কেবলমাত্র দেওয়াল এবং জানলার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে পাগল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেহেতু ওই ঘরটির বাসিন্দাটি, রাতের পর রাত জানলা দিয়ে ঝুঁকে এক দৃষ্টে দেখে যেত জাগ্রত বিশ্ব আর ঝাপসা হয়ে থাকা লম্বা নগরটির সীমানা ছাড়িয়ে কোন

দ্য মুন বগ
The Moon-Bog
১৯২১

অনেক অনেক দূরের ভয়ঙ্কর কোনও স্থানে ডেনিস ব্যারি চলে গেছে। সেটা ঠিক কোথায়, আমি জানি না। গত রাতে আমি তার সঙ্গে ছিলাম। এই এলাকার ভেতরেই সে ছিল। যখন সেই বস্তুটা তাঁর কাছে এসেছিল তখন আমি তাঁর চিৎকারও শুনতে পেয়েছিলাম। কিন্তু কাউন্টি মিথের সব চাষী ও পুলিশরা অনেক খুঁজেও তার কোনও পাত্তা পায়নি। আরও অনেকেই দূরে দূরান্তরে তার অনেক অনুসন্ধান করেছিল। লাভ কিছুই হয়নি।

এই মুহূর্তে আমি, জলাভূমি থেকে ব্যাং-এর ডাক শুনতে পেলে বা একা কোনও জায়গা থেকে আকাশের চাঁদের দিকে তাকালেই ভয়ে কেঁপে উঠছি।

ডেনিস ব্যারি আমেরিকাতে যে বেশ ভালোই আছে এবং যথেষ্ট অর্থ কামিয়েছে সেটা জানতাম। স্লিপি কীল্ডারলির জলাভূমি এলাকায় যখন ও জলা সমেত পুরোনো দুর্গটা কিনে নেয় তখন ওকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। ওই কীল্ডারলিই ওর পিতার জন্মভূমি। ও নিজেই চেয়েছিল পিতৃপুরুষের এলাকায় তাঁর সম্পদ খরচ করতে। একটা সময়ে ওই কীল্ডারলিতেই তাঁর রক্তসূত্রের পারিবারিক মানুষেরা শাসকের ভূমিকায় ছিল। ওই প্রাসাদ বানিয়েছিল তারাই। সে অনেকদিনের কথা। তারপর কয়েক প্রজন্ম ধরে ওই দুর্গ ফাঁকাই পড়ে ছিল। নষ্ট হচ্ছিল।

আয়ারল্যান্ডে যাওয়ার পর, ব্যারি আমাকে প্রায়ই লিখে জানাত, কীভাবে তার দেখভাল করার কারণে ধূসর দুর্গটি একটু একটু করে আবার সেই প্রাচীন গরিমা ফিরে পাচ্ছে। একটার পর একটা টাওয়ার আবার নতুন করে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। আইভি লতাগুলো আবার পাকে পাকে জড়িয়ে উঠছে দুর্গের গায়ে। ঠিক যেমনটা অনেক শতাব্দী আগে ঝুলে থাকত। ওই এলাকার কৃষকেরা, সমুদ্রর ওপার থেকে উপার্জন করে আনা অর্থ খরচ করে পুরনো স্বর্নালী দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনার জন্য ওকে আশীর্বাদ করছেন। কিন্তু এরপরই শুরু হয় যত সমস্যা। কৃষকেরা আশীর্বাদ করা বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ থেকে সবাই দূরে পালিয়ে যায় অজানা কিছুর আশংকায়। এই সময় ব্যারি আমাকে একটা চিঠি লিখে ওখানে গিয়ে দেখা করার কথা জানায়। দুর্গে ও বড্ড একা হয়ে গেছে। কেউ নেই যার সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলতে পারে। উত্তরদিক থেকে যে সব কাজের লোকদের ও নিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে কথাই বলা যায় না।

দুর্গ এলাকার ওই বগ বা জলাভূমিটাই এই সব সমস্যার কারণ। যেদিন আমি ওখানে পৌঁছাই সেই রাতেই ব্যারি আমাকে কথাটা বলেছিল।

কীল্ডারে যখন উপস্থিত হই তখন গ্রীষ্মের সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সোনালী আলোর ছটা গিয়ে মিশেছে পাহাড় আর অরণ্যের সবুজে। প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলার নীল জলেও। দূরে একটা দ্বীপের মতো এলাকায় অদ্ভুত প্রাচীন দর্শন এক ধ্বংসাবশেষ চকচক করছিল দেখতে পেলাম। সত্যিই সূর্যাস্তটা খুবই সুন্দর ছিল।

বালিলৌয়ের কৃষকরা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, কীল্ডারলি অভিশপ্ত এলাকা। যা শোনার পর দূরে দুর্গের মাথায় আগুন জ্বলে উঠতে দেখে আমি শিহরিত হই। ব্যারির মোটরগাড়ি বালিলৌ স্টেশনে আমার জন্য উপস্থিত ছিল। এরপর আর ট্রেনে যাওয়ার পথ নেই। ওটা চালিয়ে এনেছিল উত্তর দিক থেকে নিয়ে আসা ড্রাইভার। গ্রামবাসীরা গাড়িটা এবং চালক উভয়কেই দেখেই দূরে সরে যাচ্ছিল। তাঁরপর যখন জানতে পারে, আমি কীলডেরি যাচ্ছি, তখন ফ্যাকাশে মুখে ফিস ফিস করে আমাকে বারণ করে ওখানে যেতে।

ওইদিন রাতে, আমাদের দেখা হওয়ার পর ব্যারি আমাকে জানায় কেন গ্রামের লোকেরা ওরকম বলছিল।

কৃষকেরা কীল্ডেরি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, কারণ ডেনিস ব্যারি জলাভূমির সব জল কেটে বার করে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছিল। আয়ারল্যান্ডকে সে ভালবাসে ,কিন্তু আমেরিকা তাকে অন্য মন্ত্র দীক্ষা দিয়েছে। ফাঁকা জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকবে এটা তার ভালো লাগেনি। ওই জলাভূমির জল কেটে বের করে দিতে পারলে নতুন ব্যবহারযোগ্য স্থান পাওয়া যাবে এটা সে ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছিল।

স্থানীয় কীংবদন্তি ও কুসংস্কার তাকে টলাতে পারেনি। সে ওসব শুনে হেসেছিল।

কৃষকেরা প্রথমে তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে। ভয় দেখায় অভিশাপগ্রস্থ হওয়ার। তারপর ব্যারির দৃঢ়তা দেখে ওখান থেকে নিজেদের বসবাসের পাট গুটিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বালিলৌতে চলে যায়। ওদের জায়গায় ব্যারি উত্তর দিক থেকে শ্রমিক নিয়ে আসে। কিছুদিনের ভেতর যখন পরিচারক ভৃত্যের দল পালায় তখনও একইভাবে উত্তরের অঞ্চল থেকে সে নতুন পরিচারক ভৃত্যদের নিয়ে আসে। কিন্তু এই নতুন মানুষগুলোর সঙ্গে ও সেভাবে মিশতে পারেনি। অপরিচিতদের মধ্যে একাকী হয়ে বাস করছিল। তাই আমাকে ডেকে পাঠায়।

কীল্ডারি থেকে মানুষদের পালিয়ে যাওয়ার কারণটা শুনে আমিও জোরে জোরে হেসে উঠলাম, ঠিক যেভাবে আমার বন্ধু হেসেছিল। হাসবো নাই বা কেন, ওদের ভাবনার সঙ্গে জুড়ে ছিল এক আবছা, অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য এক আতঙ্ক। ওরা ওই জলাভূমির কিছু ভিত্তিহীন কিংবদন্তীকে মনে প্রাণে বিশ্বাস